Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.92-100
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মহাকবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: একটি তুলনামূলক সমীক্ষা

ইব্রাহিম আলি মণ্ডল
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Although separated by two thousand years, Rabindranath had a deep connection with Kalidasa. Similarities can be found between Kalidasa's mentality and that of Rabindranath's.That is the thing which is deeply ingrained within poets and within us. Just as a poet colors the reflections of the outer world with the sweetness of his own mind, Rabindranath also imbued Kalidasa with the sweetness of his own mind. Rabindranath's Kalidasa,is the "Kalidasa" who is embraced by the mind of Rabindranath."From a young age, the poet became acquainted with Kalidasa's poetry through a home tutor. During adolescence, in the era of "Chhabi O Gaan" (Pictures and Songs), the poet encountered Kalidasa in the realm of beauty's allure, in the mysterious imagination of an unspecified romantic heroine." Kumarasambhava," "Shakuntala," and "Meghaduta" have most inspired Rabindranath's awareness of love and beauty. "Meghaduta" and "Ritusanhara" have added new dimensions to the poet's vision of nature.In the poems "Chaitali," "Tapoban," and "Prachin Bharat," glimpses of the Raghuvansha can be seen. The epic "Kumarasambhava" has infused new colors into Rabindranath's romantic imagination. In Kalidasa's romantic fantasies, Rabindranath has discovered both the earthly impurities and the heavenly purity, the frenzy of youth, and the tranquility of old age. "Kumarasambhava" has not remained confined to poetry alone; from "Shakuntala" and "Meghaduta" as well, Rabindranath has extracted the essence of love to create exquisite forms.

Keywords: Love-nature, philosophy, spirituality, language-rhythm-embellishment, woman, existence.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন—"আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারে বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাহার আনন্দ আবেগ পূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।"[১] আবার 'ছেলেবেলা'য় তিনি বলছেন—"জ্ঞানবাবু আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়েছিলেন কুমারসম্ভব।"[২] অর্থাৎ কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অতি বাল্যকালেই। সুতরাং কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে তজাকবে এটাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও কবিধর্মের সঙ্গে কালিদাসের সৃষ্টি ও কবিধর্মের এবং রবীন্দ্রমানসের উপর কালিদাসমানসের প্রভাব এই নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। অতএব, তা না করে, আমি এই গ্রন্থে কালিদাসের ভাষা, চিত্র, বর্ণনা, প্রেম-প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রভাব তুলে ধরতে চেয়েছি, যা রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিভিন্ন রচনায় কালিদাসের গ্রন্থ থেকে প্রচুর সংখ্যক শ্লোক তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। যা তাঁর আলোচনাগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং 'ঋতুসমহার' এর মতো কবিতাগুলি তাদের ছন্দময় উজ্জ্বলতার জন্য পালিত হয়, যেখানে শব্দগুলি একটি সুরেলা স্রোতের মতো প্রবাহিত বলে মনে হয়। কালিদাসের কাব্যশৈলীটি সংস্কৃতের অন্তর্নিহিত সংগীতের সুরেলা মিশ্রণ এবং চাক্ষুষ চিত্রের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাঠকের জন্য একটি সংশ্লেষিত অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

বাংলার নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষায় এই গীতিময় সংবেদনশীলতা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ঠাকুরের লেখা, কবিতা, গান বা গদ্য আকারে হোক না কেন, তাদের সুরের গুণ এবং শব্দের শক্তির মাধ্যমে গভীর আবেগ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতার জন্য পালিত হয়। ঠাকুরের ভাষার সাঙ্গীতিকতা স্পষ্ট হয় যেভাবে তিনি দক্ষতার সাথে বাংলার ছন্দ এবং অলংকার ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিচালনা করেছেন, একটি সম্মোহনী প্রভাব তৈরি করেছেন যা পাঠককে উচ্চতর নান্দনিক অভিজ্ঞতার রাজ্যে নিয়ে যায়।

সমালোচকরা প্রায়শই কালিদাস এবং ঠাকুরের কাব্যিক শৈলীর মধ্যে সমান্তরাল আঁকেন, ভাষার সঙ্গীতিকতা, প্রাণবন্ত চিত্রের ব্যবহার এবং মানুষের আবেগের সারাংশ ক্যাপচার করার ক্ষমতার উপর জোর প্রভাব লক্ষ করেছেন। উভয় লেখকই তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় অসামান্য দক্ষতা রাখে। যা তাঁদেরকে এমন শ্লোক বা কবিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম করে যা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উদ্দীপক নয় বরং আবেগগতভাবে অনুরণিতও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা 'বনফুল'। তাঁর কাব্যসৃষ্টির শুরুতেই কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট। 'বনফুল' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের উদ্ধৃতি—"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ"।[৩] 'বনফুল' আখ্যানকাব্যের নায়িকা কমলা যেন শকুন্তলার আদর্শেই নির্মাণ। বনপ্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার যে সম্পর্ক কমলার সঙ্গেও সেই বনপ্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন। শকুন্তলা যখন তপোবনপ্রকৃতি ছেড়ে পতিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন তখন কালিদাস যে বেদনার ছবি এঁকেছেন তা রবীন্দ্রনাথ পথিকের সঙ্গে কমলার বিদায়যাত্রাকালে সেই বেদনাময় ছবি তুলে ধরেছেন—

> "তুলিয়া নয়নদ্বয় বালিকা সুধীরে কয়,
> বিষাদে ব্যাকুল আহা কোমল হৃদয়—
> 'কুটীর! তোদের সবে ছাড়িয়া যাইতে হবে,
> পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয়।
> হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি,
> দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায়—
> ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি

তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়!
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়?[৪]

মহাকবি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন প্রকৃতির অপর সত্তা। প্রকৃতির সাথে তাঁদের সংযোগটি একটি সূক্ষ্ম নৃত্যের অনুরূপ, যেখানে লেখকের শব্দগুলি মনোমুগ্ধকর আন্দোলনে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক জগতটি মনোমুগ্ধকর মঞ্চে পরিণত হয়। কালিদাসের কালজয়ী শ্লোকগুলিতে, প্রাকৃতিক রাজ্যটি নিছক একটি পটভূমি নয়, বরং একটি জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের সত্তা যা একটি ঐশ্বরিক ছন্দে স্পন্দিত হয়। তাঁর কাব্য, যেমন 'ঋতুসমহার' এবং 'মেঘদূত' হল সদা পরিবর্তনশীল ঋতুগুলির একটি সিম্ফোনিক উদ্‌যাপন, যেখানে আবহাওয়া এবং ল্যান্ডস্কেপের প্রতিটি পরিবর্তন গভীর প্রতীকী অনুরণনে আবিষ্ট। কালিদাসের লেখনী মেঘ, নদী এবং ফুলকে সংবেদনশীল প্রাণীতে রূপান্তরিত করে, পাঠককে প্রাকৃতিক জগতের পবিত্র স্পন্দনের সাথে যোগাযোগ করতে আমন্ত্রণ জানায়।

প্রকৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর প্রতিধ্বনি খুঁজে পায়। যাঁর লেখায় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি গভীর ও স্থায়ী ভালবাসা রয়েছে। ঠাকুরের কবিতা এবং গদ্যগুলি প্রাকৃতিক জগতের প্রাণবন্ত, উদ্দীপক চিত্রে পরিপূর্ণ, গাছের মৃদু দোলা থেকে পুকুরের ঝিলমিল প্রতিফলন পর্যন্ত। তাঁর শব্দগুলি চিত্র হয়ে ওঠে, একটি মহৎ সৌন্দর্যের ক্যানভাস আঁকা যা ইন্দ্রিয়কে মোহিত করে এবং আত্মাকে আলোড়িত করে।

প্রকৃতির সাথে সংযোগ, প্রাকৃতিক রাজ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বের এই গভীর উপলব্ধি, কালিদাস এবং ঠাকুরের দূরদর্শী প্রতিভার প্রমাণ। তাঁদের লেখাগুলি আমাদের নিজেদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা অতিক্রম করতে এবং পৃথিবীর নিরন্তর ছন্দে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করতে, সান্ত্বনা, অনুপ্রেরণা এবং জীবনের বিশাল সিম্ফনিতে আমাদের স্থানের গভীরতর অনুভূতি খুঁজে পেতে আমন্ত্রণ জানায়।

প্রেম এবং সম্পর্কের জটিল নৃত্য, তার সমস্ত আনন্দ এবং বেদনাসহ একটি চিত্তাকর্ষক জগৎ—যা মহাকবি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ই সাহিত্য-শিল্পের মাধ্যমে বুনেছে। কালিদাসের কালজয়ী শ্লোকগুলিতে, প্রেম একটি সূক্ষ্ম পদ্ম ফুলের মতো ফুটেছে, এর পাপড়িগুলি এমন করুণায় উদ্ভাসিত হয়েছে যা হৃদয় ও মনকে মোহিত করে। তাঁর 'শকুন্তলা' এবং 'মেঘদূত' এর মতো কবিতাগুলি মানুষের আবেগের কোমল জটিলতার মধ্যে পড়ে, যেখানে মিলনের পরমানন্দ বিচ্ছেদের যন্ত্রণা দ্বারা গঠিত হয়। কালিদাসের শব্দগুলি আত্মার একটি সিম্ফনি হয়ে ওঠে, যেখানে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং ভক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতাগুলি তাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়।

একইভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলি একটি সমৃদ্ধ এবং জটিল উদ্যান, যেখানে প্রতিটি কবিতার চরণে প্রেমের সুবাস লেগে থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের আনন্দময় মিলন বা হৃদয়বিদারণের তিক্ত যন্ত্রণার অন্বেষণ হোক না কেন, ঠাকুরের লেখায় একটি বিরল সংবেদনশীলতা রয়েছে যা মানুষের অভিজ্ঞতার গভীরতম কণ্ঠের সাথে অনুরণিত হয়। তার চরিত্রগুলো নিছক আবেগের পাত্র নয়, জীবন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতিমূর্তি বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা যা মানুষের অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করে।

এই কবিদের কলমে প্রেম নিছক একটি ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি নয়, বরং একটি রূপান্তরকারী শক্তি যা অস্তিত্বের বুননকে আকার দেয়। কালিদাস এবং ঠাকুর তাদের গল্পগুলিকে একটি নিপুণ স্পর্শে বুনেছেন,

নির্বিঘ্নে পবিত্র এবং অপবিত্র, ঐশ্বরিক এবং পার্থিবকে মিশ্রিত করেছেন, যা একবারে নিরবধি এবং গভীরভাবে ব্যক্তিগত।

কালিদাসের অনন্যসৃষ্টি 'কুমারসম্ভব'। এই মহাকাব্য গ্রন্থের নায়িকা উমার রূপবর্ণনায় এক অভিনবত্বের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। কাব্যে উমার পদযুগল যেখানে যেখানে পড়ে, ঠিক তখনই অনুভব হয় যেন সেই জায়গায় স্থলকমল ফুটে উঠেছে—

"অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাতি
নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদগিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।।"১/৩৩[৫]

এই শ্লোকের মৃদু ধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কমল' কাব্যগ্রন্থের 'চরণ' কবিতায় অনুরণিত হতে দেখি—

"দুখানি চরণ পরে ধরণীর গায়—
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শতি বনন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শত লক্ষ কুসুমের পরশ স্বপন।"[৬]

কালিদাসের কালজয়ী শ্লোকগুলিতে, নারীরূপ নিছক পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, বরং পবিত্র ও মহিমার মূর্ত প্রতীক। 'শকুন্তলা' এবং 'কুমারসম্ভব'-এর মতো তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলি এমন মহিলাদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত যারা অভ্যন্তরীণ দীপ্তির গভীর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন, তাদের উপস্থিতি নারীর চেতনার রূপান্তরকারী শক্তির প্রমাণ। শকুন্তলা, বন্য-ফুল দাসী যিনি একজন রাজার হৃদয়কে ধারণ করেন, নারীত্বের ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রতি কালিদাসের শ্রদ্ধার প্রমাণ। তার চরিত্রের শক্তি, তার অটল ভক্তি এবং তার সহজাত অনুগ্রহ নশ্বর অস্তিত্বের সীমানা অতিক্রম করে, তাকে পৌরাণিক এবং কিংবদন্তীর রাজ্যে উন্নীত করে।

বিশ্বকবি, কালিদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, নারী চরিত্রগুলি তৈরি করেন যা একটি বিরল এবং চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল করে। তার কাব্যিক রচনায়, নারীরা নিছক আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়, বরং পবিত্র নারীর মূর্ত প্রতীক, গভীর জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের অধিকারী যা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে।

এই কবিদের হাতে, নারীত্বের উদ্‌যাপন লিঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে, মানব চেতনার রূপান্তরকারী শক্তির সর্বজনীন প্রমাণ হয়ে ওঠে। কালিদাস এবং ঠাকুর, নারী চরিত্রে সৃষ্টিতে তাঁরা নিপুণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যা আমাদেরকে নারীর ঐশ্বরিক নৃত্যের সাক্ষী হতে আমন্ত্রণ জানান, যেখানে অনুগ্রহ, শক্তি এবং প্রজ্ঞা অনুপ্রেরণা এবং আলোকিতকরণের একটি মাধ্যম তৈরি করতে একত্রিত হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তমল নাটকে দুষ্যন্ত তার অন্যতমা মহিষী হংসপদিকার গান শুনে অন্যমনা হয়ে পড়ে এবং বলেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"[৭]

তার এই ব্যাকুলতাবোধ, এই বেদনাবোধ যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতায় সেই ভাবের একধাপ সম্প্রসারণ করে বলেছেন—

"আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা—
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'মেঘদূত' একটি অনন্য কবিতা। অসাধারণ সৃষ্টি। কালিদাসের যক্ষ-যক্ষপত্নীর বিরহগাথায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানব-মানবীর বিরহ প্রত্যক্ষ করেছেন—এখানেই তাঁর কবিকল্পনার অনন্যত্ব। কালিদাস যা বিশেষ চরিত্রে প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে নির্বিশেষ- ভাবেই গ্রহণ করেছেন। 'মেঘদূত' কবিতার উপসংহারে কবি বলেছেন—

"ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান-
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে।"[৯]

—কবিতার মর্মকথা এইখানেই নিহিত রয়েছে। আর এই ভাবই রবীন্দ্রনাথকে এক স্বতন্ত্র কবিভাবনার পরিচায়ক হিসেবে রূপদান করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কালিদাসের মেঘদূতকে অবলম্বন করেই। কবিতাটির সর্বত্র মেঘদূতের ভাষা, উপমা, চিত্র, এসব ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। 'মেঘদূত' কবিতার প্রথমেই—

"কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—
লিখেছিলে মেঘদূতে!"[১০]

স্পষ্টতই স্মরণ করায় কালিদাসের মেঘদূতের সেই শ্লোক—

'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং'।[১১]

শৈল্পিক দক্ষতার ঝলমলে পৃষ্ঠের নীচে, মহাকবি কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাগুলি দার্শনিক অনুসন্ধানের গভীরতায় অনুপ্রাণিত যা মানুষের অভিজ্ঞতার মূল সারাংশটি অনুসন্ধান করে। কালিদাসের সুস্পষ্ট মহাকাব্য এবং গীতিমূলক শ্লোকগুলিতে, পাঠককে আধিভৌতিক চিন্তার যাত্রা শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যেখানে পার্থিব এবং ঐশ্বরিক অস্পষ্টতার মধ্যে সীমানা এবং মহাজাগতিক রহস্যগুলি উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাঁর 'কুমারসম্ভব' এবং 'মেঘদূত' এর মতো কবিতাগুলি প্রতীক ও

রূপকতার জটিল জাল বুনেছে, পাঠককে ভাষার ইন্দ্রিয়সুন্দর তলদেশে অনুসন্ধান করতে এবং মানব অবস্থার কেন্দ্রস্থলে থাকা গভীর সত্যগুলিকে উন্মোচন করতে আমন্ত্রণ জানায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য রচনাও, অস্তিত্বের জটিলতা বোঝার জন্য তাঁর অটল অনুসন্ধানের একটি প্রমাণ। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির নির্মল মনন থেকে শুরু করে তাঁর গদ্যে মানুষের মানসিকতার আত্মা-আলোড়নকারী অনুসন্ধান, ঠাকুরের রচনাগুলি এমন মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য একটি সমাবেশের আহ্বান যা যুগে যুগে দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের বিমোহিত করেছে। ঐশ্বরিক প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যুর চক্রাকার ছন্দ, বা ব্যক্তি এবং বিশ্বজগতের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য, কালিদাস এবং ঠাকুরের রচনাগুলি পাঠককে বস্তুজগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে এবং একটি অনুসন্ধানে যাত্রা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিজয়নী'। এই কবিতায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অতীতের সৃষ্টির ছায়া যেন রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। স্নানকেলি সম্পন্ন হওয়ার পর নারীর অনাবৃত দেহকে ঘিরে বসন্তের মত্ত উদ্দীপনার আভাস রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের পটভূমিকায় গড়ে তুলেছেন—

"ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ মৃগ—বসন্ত পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।"[১২]

কুমারসম্ভবে কবি বলছেন—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডয়ত কৃষ্ণসারঃ॥"[১৩] ৩।৩৬

'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় কবি নাগরিক সভ্যতার পরিবর্তে তপোবন-জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে তাকে তপোবনের পবিত্র ছায়ায়, ক্লান্তিরহিত দিনগুলি, সন্ধ্যার স্নান, গোচারণ, শান্ত সামগান, নীবার-ধান্যের মুষ্টি এবং বল্কলবসন দেওয়া হোক। কবির অঙ্কিত তপোবন-জীবন স্পষ্টতই কালিদাসের রঘুবংশ ও অভিজ্ঞান শকুন্তল মহাকাব্যে অঙ্কিত তপোবন-জীবনকেই স্মরণ করায়। এই কবিতাটিতে, কবি নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা ও চাপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার এবং প্রকৃতির শান্তি ও নির্জনতায় আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে তপোবন-জীবন তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে এবং সত্যিকারের সুখ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন—

"দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার-ধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন।"[১৪]

কালিদাসের কালজয়ী শ্লোকগুলিতে, কেউ ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, যার সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত বিশ্বের গভীর সচেতনতা রয়েছে। তাঁর কবিতা, যেমন 'মেঘদূত' এবং 'ঋতুসমহার' হিন্দু ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ প্রতীক ও পৌরাণিক উল্লেখে নিমজ্জিত, তবুও তারা এমন একটি সর্বজনীনতার অধিকারী যা ভূগোল এবং ভাষার সীমানা অতিক্রম করে।

বাংলার বিশ্বসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, একই পথে হাঁটছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির সারমর্মকে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিশ্রিত করেছেন যা মানুষের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করে। তাঁর লেখাগুলি, কবিতা, গদ্য বা নাটকের আকারে হোক না কেন, স্থানীয়কে বিরামহীনভাবে বিশ্বব্যাপী সংহত করার ক্ষমতার প্রমাণ, একটি সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ তৈরি করে যা বিশ্বের আন্তঃসম্পর্ককে উদ্‌যাপন করে। ঠাকুরের রচনার পৃষ্ঠাগুলিতে, পাঠককে কলকাতার ঘূর্ণিঝড়, রাস্তা, গ্রামীণ বাংলার নির্মল প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পশ্চিমের কোলাহলপূর্ণ মহানগরীগুলি অতিক্রম করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, যখন সর্বজনীন থিমের সংস্কৃতি অনুরণিত হয়। তার চরিত্রগুলি, যেমন আলোকিত চিত্রাঙ্গদা বা রহস্যময় কাদম্বরী, ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যকে মূর্ত করে, তবুও তারা আধুনিক, বিশ্বায়িত বিশ্বের জটিলতার সাথেও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'কাব্য' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। কালিদাসকে অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, কঠোর ক্রুর দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এই সকল বিষয়ই তাঁকে যন্ত্রণা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সাহিত্যকর্মের গুণগান গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, কালিদাস দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, মান-অপমান সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে জীবনের সুন্দর দিকটিকেই তাঁর কাব্যে আনন্দ-অমৃতরূপে দান করে গেছেন। কালিদাস প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেমের মধুরতা, জীবনের আনন্দ-উৎসব—এসবকেই তাঁর কাব্যে অমর করে রেখেছেন। কবিতাটির মূল বার্তা হলো, জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবেই। কিন্তু আমাদের উচিত জীবনের সুন্দর দিকগুলোতে মনোযোগ দেওয়া এবং সেগুলো উপভোগ করা। কালিদাস তাঁর জীবনের দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও জীবনের সুন্দর দিকগুলোকে তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন—

> "তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
> আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
> হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
> রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন
> কখনো কি আওহ নাই অপমানভার,
> অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
> অভাব কঠোর ক্রুর—নিদ্রাহীন রাতি
> ---
> জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
> অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।"[১৫]

যখন বর্ষার মেঘ অন্ধকারের জালে পৃথিবীকে আবৃত করে, তখন কবির মন অন্তররাজ্যের কল্পলোকে ভ্রমণ করে। সেই কল্পলোকে বসে যখন বর্ষার কাব্য রচনা করেন, তখন মহাকবি কালিদাসের মনোলোক তার কানে ভেসে আসে। কল্পনার 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় বর্ষার রূপ-বর্ণনায় কালিদাসের প্রভাব স্পষ্ট।

কালিদাসের মতোই, কল্পনার কবিও প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করেন। বর্ষার বিভিন্ন দিক—মেঘের গর্জন, বৃষ্টির ঝমঝম, নদীর উচ্ছ্বাস—কবিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে।

"কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না;
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।[১৬]
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।"

বর্ষার সমাগমে 'তরুণী পথিকললনা' স্মরণ করিয়ে দেয় কালিদাসের—

"ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদংগৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।"[১৭] —পূর্বমেঘ, ৮

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বপ্ন' কবিতাটির মাধ্যমে সুদূর অতীতে গিয়েছেন। আসলে এই অতীতচারণ হল সৌন্দর্যলোকে প্রিয়ার উদ্দেশে কবির মানস-অভিসার। কবি তাঁর মানসপ্রিয়ার জন্য এক অপরূপ বেশবাস ও প্রসাধনের ছবি এঁকেছেন। তাতে অলংকার সুন্দরীদের বেশবাস ও প্রসাধনের ছায়া-সম্পাত ঘটেছে—

"মুখে তার লোধরেণ, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে।
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নপুরখানি বাজে আধা আধা।"[১৮]

আর এই খুব সহজেই আমাদের মনে পড়ে যায় কালিদাসের মেঘদূতের সেই শ্লোক—

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥"[১৯]—উত্তরমেঘ, ২

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এঁরা সাহিত্যিক মহানুভব, একটি অতিমানবিক আধ্যাত্মিকতার তাপস্য বুনে তোলেন যা একইসাথে ব্যক্তিগত এবং বিশ্বজনীন, গোপনীয় ও বিশাল। তাঁদের শব্দগুলি একটি সুরসংলাপ হয়ে ওঠে, যেখানে ব্যক্তির গলা মহাবিশ্বের অনন্তে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়, পাঠককে ভৌতিক জগতের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আত্মার অসীম সম্ভাবনায় আশ্রয় নেওয়ার আহ্বান জানায়। তাঁদের সাহিত্যিক রচনাগুলির উজ্জ্বল নৃত্যে, কালিদাস ও রবি ঠাকুর আমাদের অপবিত্রের মধ্যে পবিত্রের অনুভব করতে, বিদ্যমান এই বিশ্ব যে দিব্য শক্তিমান সেই চেতনার ঝলক ধরতে আহ্বান জানান। তাঁদের

অতিমানবিক আধ্যাত্মিকতা লেখার শক্তির অক্ষয় ক্ষমতার প্রমাণ, যা অনুপ্রাণিত, প্রজ্ঞাপ্রদান ও মানবিক অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
২. ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
৩. অভিজ্ঞানশকুনতলা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
৪. বনফুল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
৫. কুমারসম্ভব, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
৬. চরণ, কড়ি ও কমল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
৭. অভিজ্ঞানশকুনতলা, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
৮. বসুন্ধরা, সোনারতরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
৯. মেঘদূত, মানসী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১০. তদেব,
১১. মেঘদূত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
১২. বিজয়িনী, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১৩. কুমারসম্ভব, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
১৪. সভ্যতার প্রতি, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১৫. কাব্য, চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১৬. বর্ষামঙ্গল, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১৭. মেঘদূত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
১৮. স্বপ্ন, পূরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
১৯. মেঘদূত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ

গ্রন্থপঞ্জি

1) রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১২৫ জন্মশতবার্ষিকী
2) মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ, কালিদাস গ্রন্থাবলী, নতুন কলিকাতা যন্ত্র, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ
3) চাকী, জ্যোতিভূষণ, কালিদাস সমগ্র, নবপত্র প্রকাশন, অষ্টম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০০
4) জানা, ড. নরেশচন্দ্র, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যলোক, ১৯৮৮